নারীর ক্ষমতায়ন
নেতৃত্বে বাংলাদেশ

CRI
cri.org.bd

নারীর ক্ষমতায়ন: নেতৃত্বে বাংলাদেশ

Centre for Research
and Information

সকল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা করার পথে রয়েছে বাংলাদেশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স অনুযায়ী নারী-পুরুষ সমতায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে। গত তিন বছর ধরে বাংলাদেশ তার এই অবস্থান ধরে রেখেছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়নের দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গত এক দশকে ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টিতে জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন অনেকাংশেই নির্ভর করছে নারীর ক্ষমতায়নের উপর। তাঁর সরকার নারীর ক্ষমতায়নের পথে যত বাধা আছে সেগুলো দূর করার চেষ্টা চালাচ্ছে। নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ সকল কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ সালে বরাদ্দ ছিল ২৭ হাজার ২৪৮ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ বাজেট বেড়ে দাঁড়ায় ১ লাখ ৭৩ হাজার ৭৮২ কোটি টাকায়; গত সাত বছরে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা প্রায় ২২ ভাগ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমবাজার, চাকরি এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই নারীর অগ্রগতি সম্ভব। আর তাই ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নারীর এসব সুযোগ-সুবিধার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; মোট বাজেটের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এসব খাতে। গত এক দশকে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার কমানো, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারী উদ্যোক্তা ও কর্মজীবীর সংখ্যা বাড়ানো, নারীর সামাজিক নিরাপত্তা এবং নারী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

সূচিপত্র

১। লিঙ্গ সমতা অর্জন ৫
২। সমান সুযোগ সৃষ্টি ৬
৩। নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ১২
৪। নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ পদক্ষেপ ১৪

১ লিঙ্গ সমতা অর্জন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষ গতি লাভ করেছে। তাঁর সরকার দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারীকে সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। বর্তমান সময়ের নারীরা পূর্ববর্তী নারীদের থেকে তুলনামূলকভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতার দিক থেকে এগিয়ে আছে। নারী এখন আর শুধুমাত্র গৃহিণী নয়; একজন কৃষক, সংসদ সদস্য কিংবা উদ্যোক্তা হিসেবেও সমাদর পাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষ বৈষম্য কমিয়ে আনা পৃথিবীর সেরা দশ জাতির একটি। বিগত কয়েক বছর ধরে অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত আছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে শীর্ষ অবস্থানে রেখেছে। 'জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স ২০১৮' তে বাংলাদেশ ৪৮তম স্থানে উঠে আসে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে তার প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ফোরামটির 'জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স ২০১৮' চারটি প্রধান ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যকে গুরুত্ব দিয়েছে। এই চার ক্ষেত্র হলো: শিক্ষা, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। যদিও পৃথিবীর কোনো দেশেই লিঙ্গ বৈষম্য পুরোপুরি দূর করা সম্ভব হয়নি, তবুও এই বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এর আগে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনের জন্য এমডিজি লক্ষ্যমাত্রাও বাংলাদেশ ভালোভাবে অর্জন করতে পেরেছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের আগেই নারী-পুরুষ সমতা অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৪ অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের
জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স ২০১৮
বাংলাদেশের অবস্থান

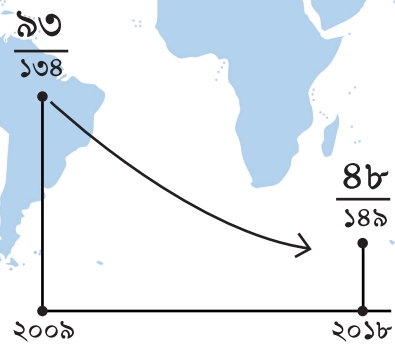

০২ সমান সুযোগ সৃষ্টি

২.১ অর্থনৈতিক পদক্ষেপ

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে বর্তমান সরকার খুব গুরুত্বের সাথে দেখছে। সরকার মনে করে যে নারীর অধিকার অর্জন ও জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য এই অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। সরকার শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত এবং লাখ লাখ নারীর জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করছে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় রয়েছে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, চাকরির সুযোগ তৈরি, শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান।

২০১৬ সালে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের হার ছিল শতকরা ৩৫.৬ ভাগ যা কিনা দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের (৩৫ ভাগ) চেয়ে বেশি। নারীর এই অংশগ্রহণ দেশীয় উৎপাদন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। কৃষিজ উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো হয়েছে; নারীর জন্য কৃষি-প্রযুক্তি অবাধ করা হয়েছে। খাদ্য-প্রক্রিয়াজাতকরণ, বসতবাড়িতে চাষবাস, নার্সারি, মধুচাষ ইত্যাদি কাজে ঋণসুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রামের শতকরা ৪৩ জন

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য

৫% সার্ভিস চার্জে
জামানত ছাড়া ক্ষুদ্রঋণ

জামানত ছাড়া
২৫ লাখ টাকা
পর্যন্ত এসএমই
ঋণ নেওয়ার সুযোগ

১০% সুদহারে
ঋণ নেওয়ার সুযোগ

সংরক্ষিত রয়েছে
১৫% পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

১০% শিল্পপ্লট বরাদ্দ

নারী এখন মৎস্যচাষে অবদান রাখছে। বাংলাদেশের শতকরা ৬০ জনের বেশি মাছচাষি এখন নারী। বর্তমানে ৪০ লাখ নারী তৈরি পোশাক খাতে কাজ করছে। সরকারের নেয়া কিছু কঠোর পদক্ষেপের কারণে পোশাকশিল্প কারখানার পরিবেশ এখন অনেক উন্নত হয়েছে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তাদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি, ঝুঁকি বিমা, পেনশন স্কিম ইত্যাদি সুবিধা চালু হয়েছে। নারী কর্মীদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির জন্য আইন কাঠামো শক্তিশালী এবং নিয়মিত কারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনেক নতুন ও উদীয়মান খাতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। হোটেল, রেস্তোরাঁ, পরিবহন, খাদ্য-প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি খাতে এখন নারীর অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়ার ফলে নারীর জন্য নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া শ্রমবাজারে ঢুকেছে এমন নারীর সংখ্যা ২০১৩ সালে এসে ২০১০ সালের প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। ২০১০ সালে যেখানে শতকরা ৪১ জন নারী কোনোপ্রকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া চাকরিতে ঢুকেছে, ২০১৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় শতকরা ২১ জনে।

এখন ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নারী উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করছে। নারীরা এখন কেবলমাত্র ১০ শতাংশ সুদে ঋণ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়া তাদের জন্য শতকরা ১৫ ভাগ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল সংরক্ষিত। নারীরা এখন কোনো জামানত ছাড়াই, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নিশ্চয়তার ভিত্তিতে ৩০ হাজার ডলারের বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) ঋণ নিতে পারছেন। ২০১৭ সালে ৫৪ হাজার নারী উদ্যোক্তা এসএমই ঋণ হিসেবে ৪ হাজার ৭৭২ কোটি টাকা হাতে পেয়েছেন। সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ সেবা চালু করেছে। গ্রামের নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শতকরা ৫ টাকা সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে কোনোপ্রকার জামানত ছাড়াই ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ শিল্প প্লট বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া তৃণমূল নারীদের উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে জয়িতা ফাউন্ডেশন। পণ্য উৎপাদন থেকে বণ্টন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করাই এই ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য।

গ্রামের হতদরিদ্র ও অসচ্ছল নারীদের কল্যাণে ও

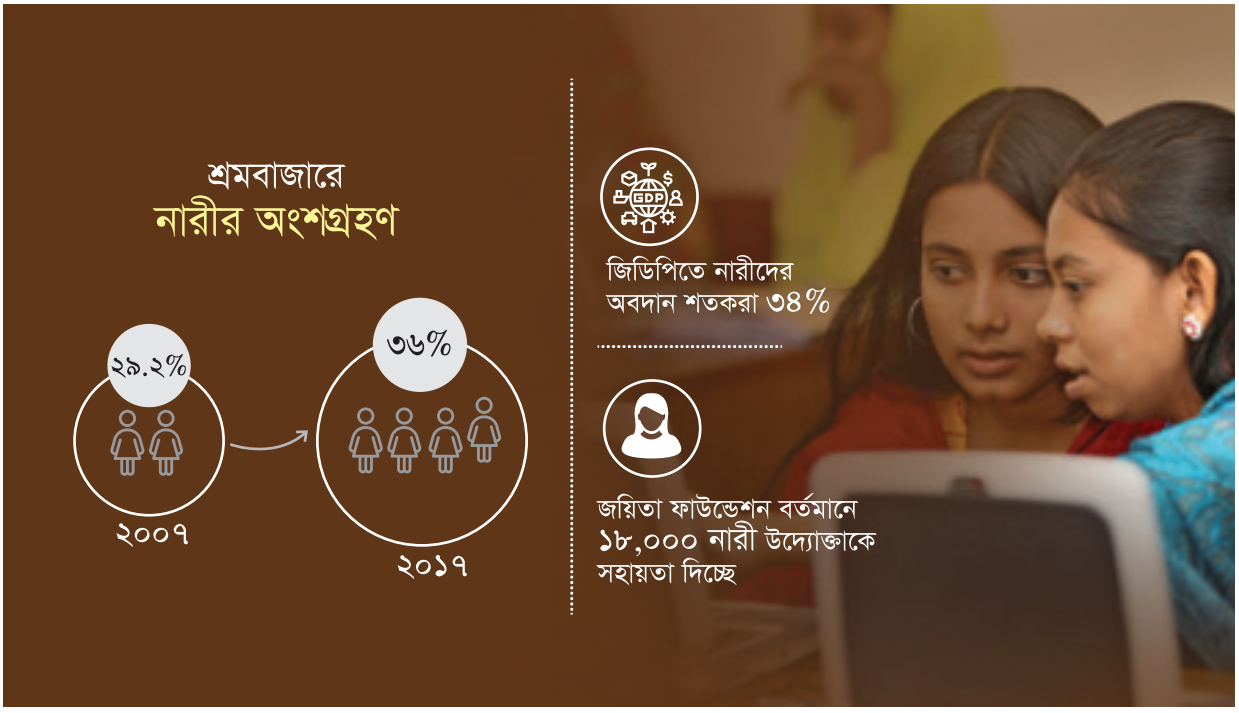

তাদের জন্য কাজের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। এসব কর্মসূচি গৃহীত হচ্ছে দপ্তরটির রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায়। প্রতি জেলায় রয়েছে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের একটি সদর দপ্তর। প্রত্যেক সদর দপ্তরে রয়েছে একটি করে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সম্প্রতি এই কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে ৬৪ জেলায় গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে সরকার উপজেলা পর্যায়ে ইনকাম জেনারেটিং অ্যাকটিভিটি (আইজিএ) নামের একটি প্রকল্প চালু রেখেছে। গ্রামের নারীদের আত্মনির্ভশীল করে তোলাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে সেলাই, পর্যটন, হস্তশিল্প, মাশরুম চাষ, কার্পেট তৈরি, দোকান চালানো, মোবাইল ফোন মেরামত, কম্পিউটার মেরামতসহ বিভিন্ন কাজে চার মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রকল্পটি দেশের ৪২৬টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

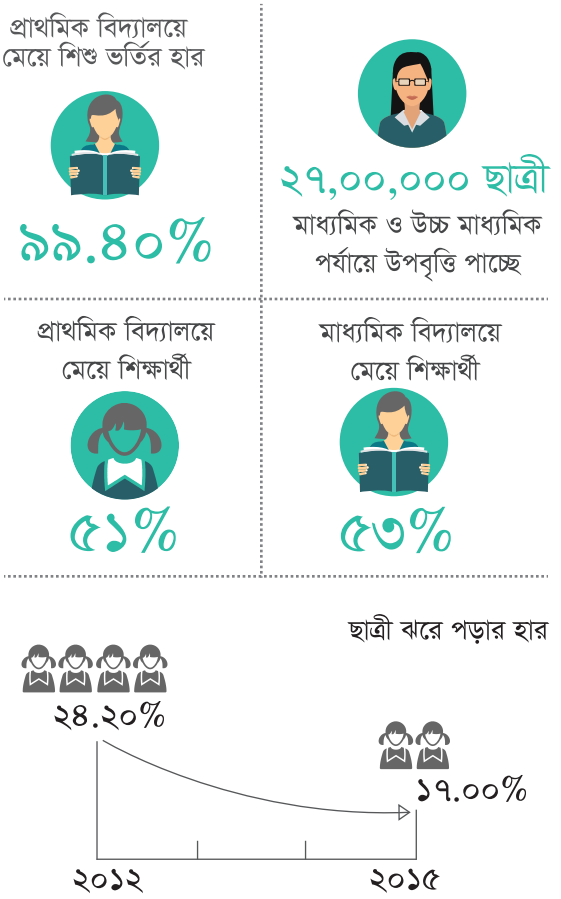

২.২ শিক্ষায় অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত এক দশকে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে । বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। এই দশ

বছরে মেয়েদের উপবৃত্তি কর্মসূচিকে বহুগুণ প্রসারিত করা হয়েছে। এর ফলে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি ও ছাত্র-ছাত্রী সমতা প্রায় শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের পড়াশোনা অবৈতনিক করা হয়েছে। ২০১৭ সালে বিভিন্ন উপবৃত্তি কর্মসূচির মাধ্যমে ২৭ লাখ মেয়ে উপবৃত্তি পেয়েছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী সমতা অর্জিত হয়েছে। ১৯৯০-৯১ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিট ভর্তির হার ছিল শতকরা ৬০.৫ ভাগ, বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে শতকরা ৯৮.৭ ভাগ। এর মধ্যে নিট ছাত্রী ভর্তির হার শতকরা ৯৯.৪ ভাগ। এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে শতকরা ৫১ ভাগ মেয়ে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৫৩ ভাগ মেয়ে। মাত্র কয়েক বছর আগে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬৫ ভাগ শিক্ষার্থীই ছিল ছেলে। আগে ২০১২ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার ছিল শতকরা ২৪.২০ ভাগ, ২০১৫ সালে তা কমে দাঁড়ায় শতকরা ১৭ ভাগ। অচিরেই বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষাতেও নারী-পুরুষ সমতা অর্জন করতে পারবে। এছাড়াও কারিগরি শিক্ষায় মেয়ে ভর্তির হার ২০১০ সালের তুলনায় শতকরা ৪৪ ভাগ বেড়েছে।

২.৩ উন্নত স্বাস্থ্য সেবা

বাংলাদেশ গত এক দশকে স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছে। জনগণ বিশেষ করে তৃণমূল নারীদের উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও লোকবল গড়ে তুলেছে।

গত দুই দশকে শিশু জন্মহার ও নবজাতকের মৃত্যুহার উভয়ই কমেছে। মাতৃত্বকালীন সেবা ও সন্তান জন্মদানের পর মায়ের যথাযথ পরিচর্যা নিশ্চিত হওয়ার ফলেই নবজাতকের মৃত্যুহার কমেছ । মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (এমএমআর) কমানোর ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। মাতৃমৃত্যু হার ২০১০ সালের লাখে ২৪২ থেকে কমে ২০১৬ সালে তা দাঁড়িয়েছে লাখে ১৭৬। অর্থাৎ বছরে গড়ে শতকরা ৪.৭ ভাগ হারে কমেছে। বর্তমান সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে এই অনুপাত লাখে ৬৩ তে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর প্রথম মেয়াদে ম্যাটারনিটি হেলথ ভাউচার স্কিম চালু করেছিলেন। এই স্কিমের মাধ্যমে একটি ভাউচার প্যাকেজ প্রদান করা হয়। এই প্যাকেজের মধ্যে থাকে গর্ভকালীন সময়ে তিনবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা, একজন দক্ষ ধাত্রীর উপস্থিতিতে নিরাপদ সন্তান প্রসব, সন্তান প্রসবের পর একবার পরীক্ষা এবং যাতায়াত খরচ। বর্তমানে দেড় লাখ নারী এই স্কিমের মাধ্যমে সহায়তা পাচ্ছে।

কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ ও প্রান্তিক নারীদের প্রাথমিক চি স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হচ্ছে। তারা এখন ১৬ হাজার ৪৩৮টি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা পাচ্ছে। এখন প্রতি মাসে গড়ে ১ কোটি রোগী কমিউনিটি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসাসেবা নিয়ে থাকে। এদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই নারী ও শিশু। কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছে ১৯৯৮ সালে। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার সরকার দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর ‘রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ (আরসিএইচসিআইবি)’

নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়। কমিউনিটি হাসপাতালকে আরও উন্নত করাই ছিল এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এছাড়াও সারাদেশে ১৩ হাজার ম্যাটারনিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, শিশুপালন, প্রসুতি সেবা এবং সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়াই এই ম্যাটারনিটি সেন্টারগুলোর উদ্দেশ্য।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার সুবিধাবঞ্চিত নারীদের স্বাস্থ্য সেবার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে বিস্তৃত করেছে। কর্মজীবী নারীরা এখন ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি পাচ্ছে। এই ছুটি চলাকালীন তাদের বেতনও বহাল থাকছে।

৩ নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

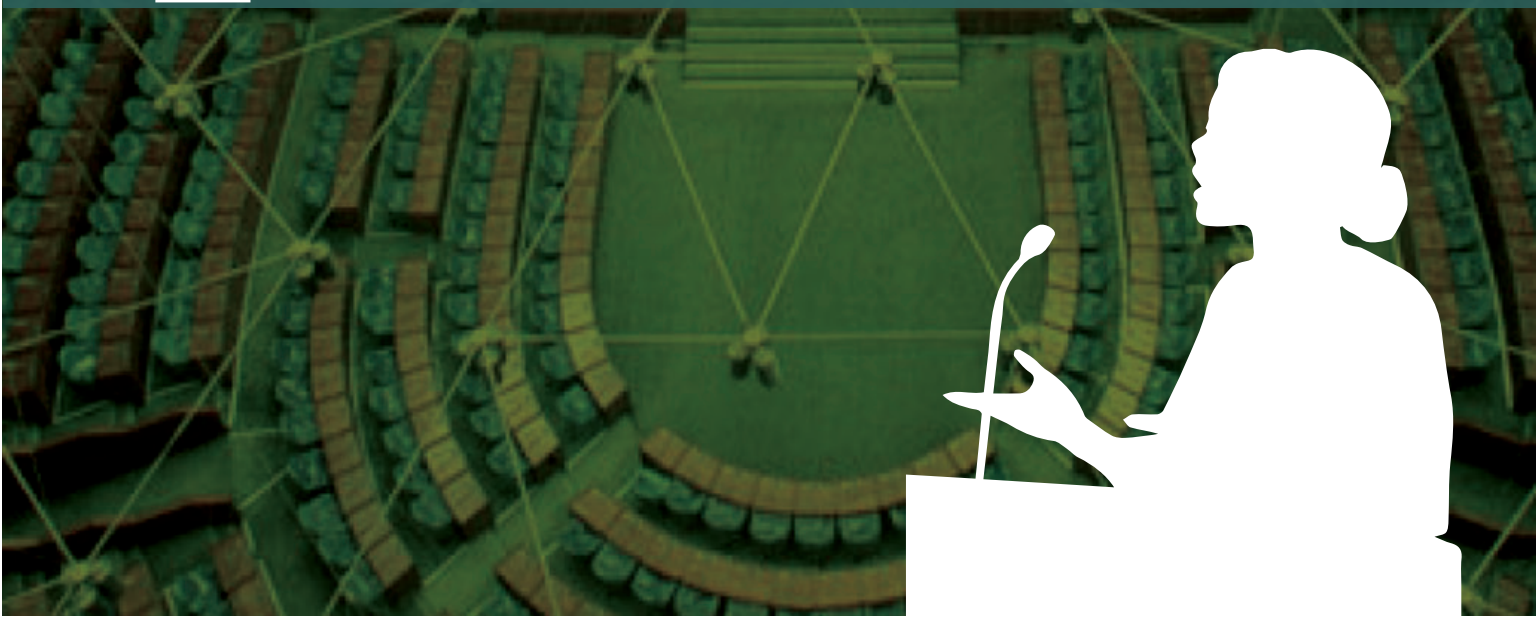

৩.১ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে। ২০১১ সালে শেখ হাসিনার সরকার সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করেছে । বর্তমানে বাংলাদেশে ৭০ জন সংসদ সদস্য নারী। এই সংখ্যা সংসদের মোট আসনসংখ্যার (৩৫০) শতকরা ২০ ভাগ। ১৯৯০ সালে মাত্র ১২.৭ ভাগ সংসদ সদস্য ছিলেন নারী। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ যার প্রধানমন্ত্রী, সংসদ প্রধান, বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং সংসদের উপনেতা নারী। এ অর্জন দেশের ভিতরে ও বাইরে প্রশংসা কুড়িয়েছে। রাজনীতিতে বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখার জন্য বাংলাদেশ 'ওমেন ইন পার্লামেন্ট (ডব্লিউআইপি)' পদক পেয়েছে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দ্বিতীয় স্থানীয় সরকার সংশোধনী আইন ১৯৯৭ পাশ করেছে। স্থানীয় সরকারে নারীর অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ আইনকে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে স্থানীয় নির্বাচনে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শেখ হাসিনার সরকার উপজেলা পরিষদ আইনের মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলায় নারী ভাইস-চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য রয়েছে **৫০টি সংরক্ষিত আসন**

সংসদে নারী সদস্য **৭০ জন** যা সাংসদদের মোট সংখ্যার **শতকরা ২০ ভাগ**

১৩,৫০০ জন নির্বাচিত নারী সদস্য স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে কাজ করছেন

রাজনীতিতে নারী-পুরুষ বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ **'ওমেন ইন পার্লামেন্ট' পদক লাভ করেছে**

৩.২ প্রশাসনে নারী

গত এক দশকে সরকারি প্রশাসনের নানা স্তরে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। প্রায় ১ হাজার ১০০ নারী এখন সরকারি প্রশাসনে উচ্চপদে কর্মরত আছেন। বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৪ জেলায় নারীরা জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করছেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেছেন ১৬ জন নারী। দেশের ৪৯১টি উপজেলা প্রশাসনিক ইউনিটে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) দায়িত্ব পালন করছে ১ হাজার ৬ জন নারী। বর্তমানে ১০ জন নারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। এই সংখ্যা মোট সচিবের শতকরা ১৩ ভাগ। ২০০৯ সালে সরকারি চাকরিতে নারী কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ২৭ হাজার ১১৪ জন। ২০১৫ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ লাখ ৭৮ হাজার ৩৫৪। সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, সহকারী কমিশনারের প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে নারীদের দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও সশস্ত্র বাহিনীতে, পুলিশের বড় পদে এমনকি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও নারীদের এখন সরব উপস্থিতি। এ সবকিছুই নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রগতির সূচক। উপস্থিতি। এ সবকিছুই নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রগতির সূচক।

৩.৩ খেলাধূলায় নারীর অধিক অংশগ্রহণ

সম্প্রতি অ্যাথলেটিকস, সাঁতার, শুটিং সহ নানা খেলায় বাংলাদেশের মেয়েদের সাফল্য ও অংশগ্রহণ প্রশংসা কুড়িয়েছে। ক্রীড়া সংগঠনগুলো নারী অংশগ্রহণকারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। ২০০৭ সালে যাত্রা শুরু করেছিল বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল। অল্প সময়ের মধ্যেই দলটি সাফল্যের শিখরে আরোহন করেছে। ২০১৮ সালের প্রমিলা টি-টুয়েন্টি এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল। এটিই বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক ট্রফি। অনূর্ধ্ব ১৬ প্রমিলা ফুটবল দল সম্প্রতি এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার জন্য মনোনীত হয়েছে। ২০১৬ সালে দক্ষিণ এশিয়া গেমসে ৬৩ কেজি ভারোত্তলনে সোনা জিতেছে অ্যাথলেট মাবিয়া আক্তার সীমান্ত। কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রতিযোগিতায়ও ৬৩ কেজি ভারোত্তলনে সোনা জিতেছেন তিনি। আরেক নারী অ্যাথলেট মাহফুজা খাতুন শিলা সাউথ এশিয়ান গেমসে ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক সাঁতারে সোনা জিতেছেন। সরকার মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপন করেছে । এখানে নারী অ্যাথলেট, ফুটবলার, ক্রিকেটার, ভলিবল খেলোয়াড়, সাঁতারু, জিমনেস্ট সবাই অনুশীলন করতে পারছেন।

৪ নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ পদক্ষেপ

৪.১ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে পদক্ষেপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে এবং নারীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের আইন কাঠামো ও নীতিমালাকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিয়েছে। এই সরকারই ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রথম জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের প্রচলন করে। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। সরকার পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০-এর মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতাকে প্রথমবারের মতো অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধি জারি করা হয়েছে। সম্প্রতি মন্ত্রীসভায় 'চাইল্ড ম্যারেজ কন্ট্রোল এক্ট ২০১৩' কে সংশোধিত আকারে 'চাইল্ড ম্যারেজ প্রিভেনশন এক্ট ২০১৭' হিসেবে গৃহীত হয়। এতে ১৮ বছর বয়সের নিচের মেয়েদের বিয়ে নিষিদ্ধ করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়াও সরকার মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ পাশ করেছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এই আইনের মাধ্যমে মানবপাচার অপরাধের শিকার মানুষদের অধিকার সংরক্ষণ ও নিরাপদ অভিবাসনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের সাহায্যার্থে জাতীয় সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। নারীরা হেল্পলাইন ১০৯ নম্বরে কল করে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়তা গ্রহণ করতে পারছেন। এছাড়াও ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, যৌতুক সংক্রান্ত বিষয়ে ৩৩৩ নম্বরে ফোন করে সাহায্য নিতে পারছেন। ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ৮ টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সহিংসতার শিকার নারীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত, আইনি ও পুলিশি সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও রয়েছে একটি ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহ সর্বক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

৪.২ সামাজিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

যেসব নারীর আর্থিক বা অন্য কোন সহায়তা প্রয়োজন সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় তাদের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমের মাধ্যমে গৃহস্থালি সম্পদ আহরণ, নানা ধরণের প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। ২০১৫-১৭ সালে সরকার ভালনারেবল গ্রুপ ডেপেলপমেন্ট (ভিজিডি) কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে এমন ৭ লাখ ৫০ হাজার নারীকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নারীদের বিভিন্ন ধরনের ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে বেশ কিছু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই সব কর্মসূচির মাধ্যমে হতদরিদ্র নারী ভাতা, প্রসূতি মায়েদের ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য ভাতা, প্রতিবন্ধী নারী ভাতা ইত্যাদি প্রদান করা হচ্ছে। বিধবা, নিঃস্ব ও হতদরিদ্র নারীরা প্রতি মাসে ৬০০ টাকা ভাতা পেয়ে থাকে। ২০১৭ সালে এই স্কিমের মাধ্যমে ১২ লাখ ৬০ হাজারের বেশি নারীকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে আরও ছয় লাখ দরিদ্র গর্ভবতী নারীকে প্রসূতি ভাতা হিসেবে তিন কোটি ৭৫ লাখ ডলার প্রদান করা হয়েছে।

সরকার ২০০৯ সাল থেকে 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পে নারী প্রাধান পরিবারকে গুরুত্ব দেয়া হয়। অর্থনৈতিক কাজে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ ও উন্নয়নই এই কর্মসূচির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সারা দেশের ৪৯০টি উপজেলার ৪ হাজার ৫৫০টি ইউনিয়নের ৪০ হাজার ৯৫০টি গ্রামে এই প্রকল্প চালু রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

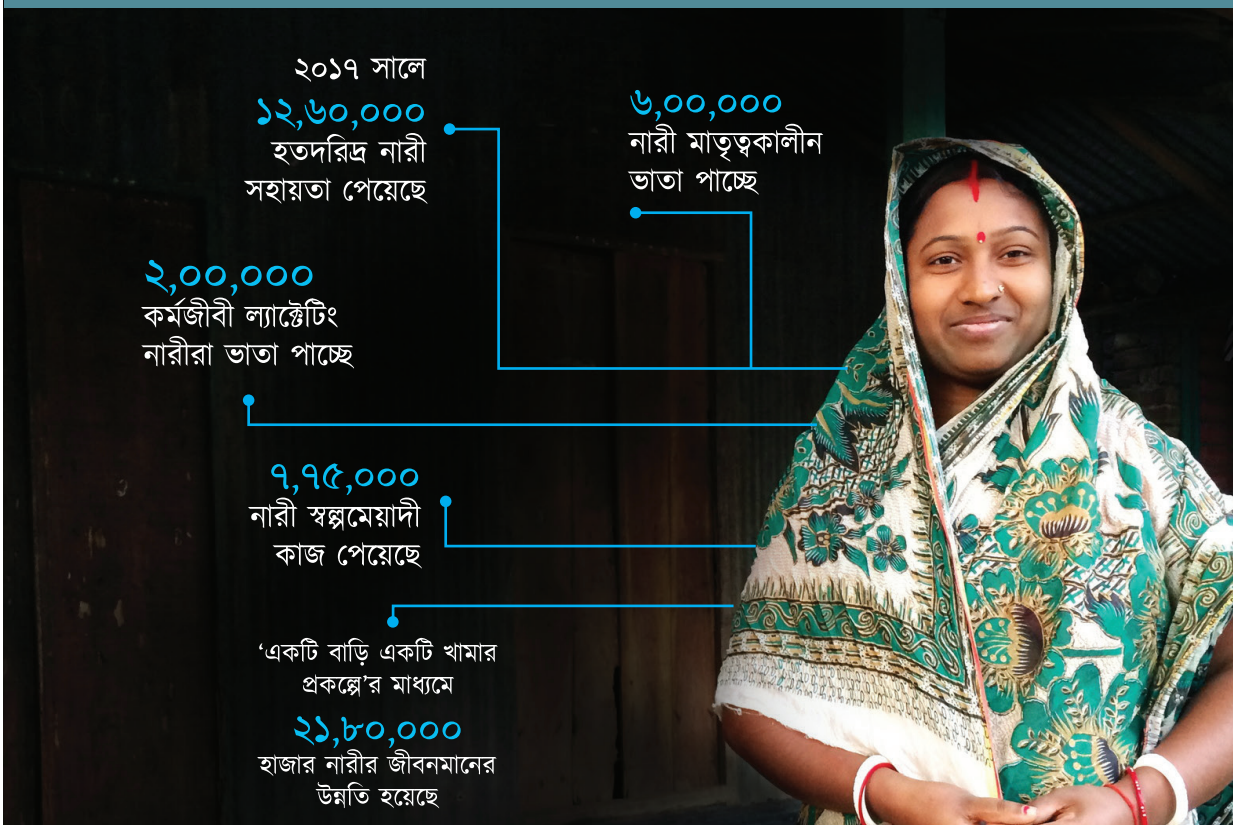

বিগত দশ বছরে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। নারীর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হয়েছে। সরকার তার নীতি সহযোগী, নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার কর্মীদের সহযোগিতায় নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের নারীরা এখন তাদের অধিকার দাবি করতে পারছে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হওয়ার দৌড়ে অংশগ্রহণ করছে এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অবদান রাখছে। তারা এখন খেলার মাঠে ঝড় তুলতে পারে, সমাজের নেতৃত্ব দিতে পারে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির প্রয়োগের ফলে সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত হচ্ছে। মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার শ্রমবাজারে নারীকে আরও অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ভাবছে। এর ফলে নারীর কাজের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশকে ২০৩০ সালের আগে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ সে লক্ষ্য অর্জনের পথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

নারীর ক্ষমতায়নঃ নেতৃত্বে বাংলাদেশ
Published by Centre for Research and Information(CRI), December 2018
H 2, R 11(New), 32(Old), Mirpur Road, Dhanmondi, Dhaka- 1209
Email: info@cri.org.bd
www.cri.org.bd

Centre for Research and Information